দ্যূতক্রীড়ক / ব্রাত্য বসু / আনন্দ পাবলিশার্স / ২০২৩

সুব্রত ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবনের প্রথম বিয়াল্লিশ বছরের শেষ পনেরো বছরকে ধরে ব্রাত্য বসুর লেখা উপন্যাস দ্যূতক্রীড়ক বইখানি যেদিন হাতে পেলাম, সেদিনই সকালে পারিবারিক পুরনো কাগজপত্রের বাণ্ডিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হাতে এল বিশ শতকের প্রথম দশকের কয়েকটি নাট্যপত্রী। উপন্যাসটি পড়া শুরু করেই দেখলাম ওই পুরনো পোকায়-খাওয়া নাট্যপত্রীগুলি পাওয়া যেন কেমন এক কাকতালীয় সমাপতন। এটা মনে হওয়ার কারণ লেখকের গল্প-বলার ঢঙে বিবৃত উপন্যাসের প্রথম অংশের কিছু বিষয়ের সঙ্গে এই পুরনো দস্তাবেজগুলি যেন আমাকে তাদের সঙ্গে বাস্তব সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিল।

নাট্যপত্রীগুলির মধ্যে ছিল ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯১৯ এই তিন বছরের 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের জুনিয়র মেম্বরগণ কর্ত্তৃক ষ্টুডেন্টস ফণ্ডের সাহায্যার্থ' তিনটি নাট্যের তিনটি নাট্যপত্র। আর ১৯১৭ সালের 'Programme'-টি একটু ব্যতিক্রমী কারণ সেটি ছিল 'THE MEMBERS OF THE Calcutta University Institute PRESENT ASHOKA IN AID OF THE "OUR DAY" FUND'। ১৯১৬ সালের নাটকটি ছিল 'তারাবাই' যার আচার্য, অর্থাৎ নির্দেশক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম,এ। সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নাম রয়েছে জ্ঞানপ্রিয় মিত্র এবং পান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের, আর 'সজ্জাকার' গিরীন্দ্রনাথ সেন। তারা-র ভূমিকায় অভিনয় করেন জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি নীরেন্দ্রনাথের পিতা। আর একটি স্ত্রী-চরিত্রে নাম রয়েছে কামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দুভূষণ রায়, রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আর ছিল 'গড়পার মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক ঐকতান বাদ্য'। ১৯১৭ সালের 'অশোক'-এ অশোকের ভূমিকায় ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি এম,এ। অন্যান্য চরিত্রে নরেশ মিত্র, নগেন্দ্রনারায়ণ বসু, জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ, এবং দুটি স্ত্রী-চরিত্রে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং কামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কার নির্দেশনায়, বা নেপথ্যে কারা ছিলেন, তার উল্লেখ নেই। যেমন উল্লেখ নেই পরের বছর 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এও। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মর দুটি ভূমিকাতেই ছিলেন রবীন্দ্রমোহন রায়, অর্জুন করেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ি (Ex-Havildar '49' Bengalis)। ১৯১৯ সালে মঞ্চস্থ হয় 'জনা', যার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। 'আচার্য্য' ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ও শিশিরকুমার ভাদুড়ি। 'সঙ্গীতাচার্য্য' ছিলেন অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম,এ। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নাম রয়েছে কামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের।

এছাড়া সেই নাট্যপত্রীগুলির মধ্যে ছিল ১৯০৯ সালের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের অভিনীত দুটি নাটকের নাট্যপত্রী যার প্রথমটি ১৬ ফেব্রুয়ারির 'Dramatic Representation of MACBETH' এবং দ্বিতীয়টি শুক্রবার ১৫ অক্টোবর ভারত সঙ্গীত সমাজ মঞ্চে 'মেঘনাদ বধ'। প্রথমটি কোন মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। প্রসঙ্গত, এর সবগুলিতেই আমার দাদামশাই অভিনয় করেছিলেন।

যাই হোক, ফিরে আসা যাক শিশিরাশ্রিত উপন্যাসটির কথায়। এক নাট্যব্যক্তিত্ব যিনি কিনা আমাদের বাংলা নাট্যজগতের দিক পরিবর্তন করে, বা বলা উচিত বাংলা নাট্যজগতের বাহনটিই পরিবর্তন করে এক আদ্যন্ত আধুনিক স্পেসশিপে তুলে তাকে নিয়ে এক বৃহত্তর কক্ষপথে স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছেন; তাঁকে নায়ক করে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের ওঠা-পড়া, তাঁর চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, তাঁর নিজের প্যাশনকে লালন করতে গিয়ে জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলায় মেতে ওঠা, তাঁর মনোজগতের ঝড়-ঝাপ্টা-বৃষ্টি-বাদল, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-নৈরাশ্য, তাঁর ব্যবহারিক জীবনে কখনও রাজপথে, কখনও কর্দমাক্ত সর্পিল পথ ধরে হেঁটে যাওয়া, তাঁর সাফল্য, তাঁর বিফলতা, তাঁর মিত্রপক্ষ-শত্রুপক্ষকে সনাক্ত করা, মায় তাঁর সম্পূর্ণ জগৎ এবং সেই জগতে তাঁর যাপনটিকে ব্রাত্য বসু তাঁর গল্প-বলায় নিয়ে এসেছেন এক অনর্গল ছন্দে। লেখক এটি করেছেন শিশিরকুমারের কনটেম্পোরারি সময়টির প্রেক্ষিতে, সেই সময়টিকে ধরে। তাই সেই সময়ের কলকাতার পথঘাট, দোকান-বাজার, যান-বাহন যেমন থাকে পাতায় পাতায় বর্ণনায়, তেমনই থাকে নিয়ন্ত্রিত লাইন স্কেচ-এ নাট্যজগৎ, অ্যাকাডেমিক জগৎ সহ বৃহত্তর বহির্জগতের রাজনৈতিক ছবি। ফলে যেন এক বিশাল ফ্রন্টেজ ও ডেপথের মঞ্চে উপস্থাপিত হতে থাকে ওই সময়টা যার মধ্যমণি শিশিরকুমার। নানা বর্ণের এক বিশাল ব্যাক-ড্রপে অভিনীত হতে থাকে শিশিরের জীবনের পনেরোটা বছর আর মঞ্চের দুই ধারে অভিনীত হয়ে চলে সাব- এবং সাব-সাব প্লটের নানান আখ্যান। সে যেন এক সারকারামা অনুভূতি।

বিভিন্ন এবং অসংখ্য ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণিত হয় এই উপন্যাসে, শিশির-জায়ার আত্মহত্যা থেকে 'সীতা' নাটকের মার্কিনি প্রদর্শন শেষে এক অনিশ্চিত আগত দিনের মোকাবিলা করতে জাহাজে দেশে ফেরা পর্যন্ত। মধ্যে ঘটে যায় অগুনতি ঘটনা, তেমনই আসে অগুনতি মানুষ। এবং এসবই বিবৃত হয় নানান সূত্র থেকে আহরিত তথ্যে, যার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বইয়ের শেষে, এবং লেখকের কল্পনাকে আশ্রয় করে, এবং তা করা হয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আবার এই সব ঘটনার অনুষঙ্গে যেমন যেমন ঘটে নানা ঘটনা, তেমন তেমন তাদেরও বিবরণ থাকে লেখকের কলমে। আবার যেসব চরিত্ররা মঞ্চে প্রবেশ করে, তাদের সংযোগে আসে অন্য চরিত্ররা, এবং এদের সংযোগে আবার আসে তৃতীয় এক দল সদস্য, এবং এদের সকলের নিজের নিজের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা ততটাই গুরুত্ব দিয়ে বিবৃত করেন লেখক। ফলে এক বিশাল মহীরুহ এবং তার শাখা-প্রশাখা এবং প্র-প্রশাখা সম-পরিচর্যায় লালিত হয় এই বইয়ে, এক আদর্শ উপন্যাসের ধর্ম মেনেই যেন।

তবে তারও মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা, কিছু কিছু মানুষের বৃত্তান্ত যেন ভীষণ এক অনিবার্য আকর্ষণে টেনে ধরে পাঠককে। এর কারণ অবশ্যই লেখকের উপস্থাপন এবং তাঁর শব্দের জাদুকরী। একজন সম্পূর্ণ নাটককার-নাট্যকারের পক্ষেই সম্ভব এমনভাবে চিত্রকল্পকে শব্দের মাধ্যমে খেলিয়ে পাঠককে বেঁধে ফেলা। ব্রাত্য বসু নাটক লেখার ক্ষেত্রে যতটা নিখুঁত থাকেন তাঁর নিক্তি-মাপা সংলাপ রচনায় এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি যে ধরনের এক মনমোহিনী সাঁকো নির্মাণ করেন দর্শকের সঙ্গে, সেই স্বাদ পাঠক পাবেন যতটা না এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথোপকথনে, তার থেকে অনেক স্বাদু, অনেক রসগ্রাহী লাগে পাঠকের, তাঁর আখ্যান-বিবৃত করার শৈলীতে, যা অনেকটা কথোপকথনের ঢঙেই রচিত। বইটির কিছু কিছু অংশ এতটাই হীরক-খচিত যে তার দ্যুতি পাঠকের অনুভবকে চিরোজ্জ্বল করে রাখে। উপন্যাসের

শেষভাগে জাহাজের ডেকে বসে তাঁর পিতার সঙ্গে কথোপকথন হয়ত বা সবথেকে উজ্জ্বল হীরক-খণ্ডটি। অথবা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের শিশিরকুমারের কাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণ, বা ছোট্ট নিভাননীর অংশটি, অথবা চারুশীলার অংশটি। তেমনই আবার বিস্তৃত বিবরণে আসে ম্যাডানদের অংশটি অথবা তাঁর বিভিন্ন থিয়েটারের সঙ্গে সংঘাত। তথ্যভিত্তিক হয়েও অনেক ঘটনা এক অদ্ভুত নাটকীয়তায় ব্রাত্য পেশ করেন। এমন বেশ কয়েকটি অংশ আছে বইটিতে যা এই তিনশো সত্তর পাতার বইটিকে গুণে ভারি করেছে অবশ্যই। কিছু কিছু শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন যা প্রথমে কিছুটা বিভ্রম ঘটালেও, পরের দিকে মজাই লাগে পড়তে, যেমন 'নিঘঘাত' [নির্ঘাত] শব্দটি।

যেহেতু বইটি ইতিহাস আশ্রিত, তা নাট্যজগতেরই হোক না কেন, তথ্যের খুঁটিনাটির বিষয়ে লেখক তাঁর লেখনীর স্বভাব অনুযায়ী খুবই সতর্ক। হয়ত বহু তথ্যই এই বিষয়ে অবগত পাঠকের জানা, কিন্তু তাকে অদ্ভুত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনার মধ্যেই পাওয়া যায় লেখকের সৃজনীশক্তির পরিচয়। এবং আরও যে বিষয়টি তাৎপর্যের তা হল লেখক কী কুশলতার সঙ্গেই না কোনও একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ওই একই সময়ে ঘটে যাওয়া একেবারেই ভিন্ন কোনও ঘটনা যা হয়ত সর্বজন খ্যাত, তার উল্লেখ করে দিচ্ছেন। এর ফলে মূল বিষয়টি একটি সার্বিক চেহারা পায়।

তবে বেশ কিছু ছাপার ভুল যেমন আছে তেমনই আছে বেশ কিছু লেখনীর ত্রুটি। এক জায়গায় লেখক লিখছেন, 'শিশির এসময়ে সন্ধেয় মাঝেমধ্যে তাঁর ছেলেবেলা থেকে অচেনা পিতার কাছে এসে মাঝেমধ্যে বসত।' আর এক জায়গায় রয়েছে, 'শিশিরকুমার তখন সেখানে বসে আলিস্যি কাটাতে তিন বন্ধুর সঙ্গে বসে অকশন ব্রিজ তাস খেলছিলেন।' মনে হয় একটু তাড়াহুড়ো করে বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তার কয়েকটি নমুনা এই রকম , রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটের বাড়ির বারান্দার 'নীচ দিয়ে চলে যাওয়া ট্রামের শব্দ'; অথবা রোমিউলাস হয়ে গিয়েছে 'রোমুক্লুস'; বা মেটারলিঙ্কের তিলতিল এবং মিতিল হয়ে গিয়েছে দুই বোন; অথবা এলফিনস্টোনের সঠিক ঠিকানা ধর্মতলা স্ট্রিট নাকি কর্পোরেশন স্ট্রিট? বা সেন্ট্রাল এভেনিউ কি তৈরির পরের বছরই চিত্তরঞ্জনের নামে হয়? তবে এ ধরনের টুকটাক ভ্রম হয়ত এড়ানো যেত আর একটু সতর্ক হলে।

নাটক এবং নাট্য বিষয়গুলিতে আমার নিজস্ব একটা উৎসাহ আছে, একটা ভালবাসা আছে। আর উৎসাহ আছে এই জগৎটার ইতিহাস নিয়ে, যেমন উৎসাহ আছে আমার নিজের শেকড়ের সন্ধান করার। দ্বিতীয় বিষয়টি এখানে আলোচ্য নয়। তবে প্রসঙ্গটি মনে এল কারণ এই উপন্যাসের বহু চরিত্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে লেখক তাদের পারিবারিক মূল উৎপত্তিস্থলটি উল্লেখ করে দেন, যেমন 'আদতে ঢাকার ছেলে' বা 'আদতে ইছাপুরের ছেলে' ইত্যাদি। অর্থাৎ যতটা সম্ভব পাঠককে তিনি নিবিষ্ট করে নেন তাঁর গল্প বলাতে। তবে আমার এই নিজস্ব নাটক-নাট্য অভিরুচির জন্য যে এই বইটি আমায় আকৃষ্ট করেছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ গল্প-উপন্যাসের থেকে নাটক, প্রবন্ধতে আমি বেশি আগ্রহী। তবে শিশিরকুমারের জীবন কোনও অংশেই পাঁচ অঙ্কের গ্রীক ট্র্যাজেডির থেকে কম নয়। তাই যে-কোনও পাঠকের কাছে তা আদরণীয় হতে বাধ্য। বিশেষ করে নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়া পাঠকের কাছে। পরতে পরতে খুলে যায় তাঁর জীবনের নানান বৈচিত্র্য, রঙ-বেরঙের নানান অনিশ্চয়তা। জীবনকে বাজি রাখেন যে শিল্পী তাঁকে 'দ্যূতক্রীড়ক' বলা সার্থক।

সুব্রত ঘোষ : নাট্যসমালোচক ও প্রাবন্ধিক।